মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি
রাহিমাহুল্লাহ

রিজাল গড়ার কারিগর

অদ্বিতীয় শিক্ষক ও অনন্য লেখক

মূল
মুফতি আবদুর রউফ গজনবি
উসতাজে হাদিস, জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি টাউন
করাচি, পাকিস্তান
অনুবাদ
উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি
উসতাজে হাদিস, জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া উমেদনগর
হবিগঞ্জ, বাংলাদেশ

মাকতাবায়ে সাঈদিয়া সিলেট
০১৮৩২১৯২১৫০ (হোয়াটসঅ্যাপ)

دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولی

ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی

“দারা ও সিকান্দর থেকে ঐ অভাবী ব্যক্তি উত্তম
যার অভাবে আছে আল্লাহর সিংহের সুবাস।”

আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল রাহি.

সূচীপত্র

একজন বিশিষ্ট ফকিহের চিরবিদায়.......... ৪

জীবনের সামগ্রিক চিত্র.......... ৪

বৈশিষ্ট্যাবলী.......... ৮

পাঠদান ও রচনাকার্যে পরিপূর্ণ নিবিষ্টতা.......... ৯

হিম্মত ও অবিরাম মেহনত..........১১

জ্ঞানসাধনায় আত্মত্যাগের একটি ঘটনা..........১২

বোঝানোর স্বতন্ত্র পদ্ধতি..........১২

দীক্ষা ও রিজাল তৈরি..........১৩

রিজাল গড়ার প্রথম ঘটনা..........১৪

দ্বিতীয় ঘটনা..........১৬

তৃতীয় ঘটনা..........১৭

দীনি গোস্সা ও সত্যকথন..........১৮

অধমের প্রতি অগণিত অনুগ্রহ..........১৯

তর্জনী দ্বারা ইশারা করার মাসআলায় রাহনুমায়ি..........১৯

ইমামতি ও শিক্ষকতায় দিকনির্দেশনা..........২১

হিফজে কুরআনের ক্ষেত্রে অধমের ওপর বিরাট অনুগ্রহ..........২১

পাকিস্তান প্রত্যবর্তনের পর কদমে কদমে রাহনুমায়ি.......... ২৩

উন্নতি ও সফতার রহস্যকথা.......... ২৪

একটি নীরব আকাঙ্ক্ষা; যা পূর্ণ হয়েছে.......... ২৮

একজন বিশিষ্ট ফকিহের চিরবিদায়

২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ। (ইণ্ডিয়ার সময়) সকাল সাড়ে ছয়টা। মুহাদ্দিসে জালিল, মুফাসসিরে নাবিল, বিশিষ্ট ফকিহ, আলিমে রব্বানি, মুসনিদে হিন্দ হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রাহি. ও হুজ্জাতুল ইসলাম হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবি রাহি. দ্বয়ের উলুমের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকারী, মাসলাকে দারুল উলুম দেওবন্দের সত্যিকার মুখপাত্র, দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হজরতুল উসতাজ মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ বোম্বের একটি হাসপাতালে অনুমানিক আশি বছর বয়সে মাওলায়ে হাকিকির সান্নিধ্যে লাব্বাইক বলেন। এই মৃত্যুসংবাদ শুধু উপমহাদেশে নয়; বরং পুরো বিশ্বে বিক্ষিপ্ত অগণিত ছাত্র, ভক্ত, মহব্বতকারী ও সরাসরি কিংবা মাধ্যমে উপকৃত হওয়া ব্যক্তিদের ব্যাকুল করে তুলেছে। তারা নিজেদের শোকাহত ও ভাঙ্গা হৃদয়ের সাথে আল্লাহর ফয়সালার সামনে নতিস্বীকার করতঃ বরকতময় রমজান মাসের শেষ দশকে অনেক অনেক ঈসালে সওয়াব, মাগফিরাত কামনা ও স্তর বৃদ্ধির দুআ করেছেন। পাশাপাশি পরিবার ও দারুল উলুম দেওবন্দের জিম্মাদারদের খেদমতে মাসনুন সান্ত্বনা প্রেরণ করেছেন।

জীবনের সামগ্রিক চিত্র

হজরতুল উসতাজ মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর জন্মসন তার অনুমান অনুসারে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৬০ হিজরি। নিজেই “তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন” ৬ষ্ঠ খণ্ডের শুরুতে ‘প্রকৃত অবস্থা’ শিরোনামে বিবৃত করেছেন। জন্মভূমিতেই প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুরে। উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে ১৩৮০ সালে দারুল উলুম দেওবন্দে

ভর্তি হন এবং ১৩৮২ হিজরি মোতাবেক ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে বার্ষিক পরীক্ষায় ১ম স্থান অর্জনের মাধ্যমে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন। ছাত্রজীবনে সকল আসাতিজায়ে কেরাম বিশেষত দারুল উলুম দেওবন্দের তৎকালীন সদরুল মুদাররিসিন হজরত আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহিম বিলয়াবি সাহেব কুদ্দিসা সিররুহুর বিশেষ দৃষ্টি ও স্নেহের পাত্র ছিলেন।

দাওরায়ে হাদিস থেকে ফারাগতের পর তাকমিলে ইফতায় ভর্তি হন। ফতোয়া অনুশীলনে এতটা যোগ্যতা অর্জন করেন যে, দারুল ইফতার জিম্মাদরগণ লিখিতভাবে তার নিয়োগের সুপারিশ করেন। এদিকে তার মুহতারাম উসতাজ ও মুরব্বি, দারুল উলুম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসিন হজরত আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহিম বিলয়াবি সাহেব কুদ্দিসা সিররুহুর বাসনা এমনই ছিল। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা অন্য কিছু ছিল। ফলে দারুল উলুম দেওবন্দে নিয়োগ হয়নি। হজরত বিলয়াবি রাহি. তাকে সান্ত্বনা দিতে অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান একটি বাক্য বলেছিলেন– "মৌলবি সাহেব! মন খারাপ করবে না; একদিন এরচেয়ে ভালো পজিশনে আসবে।" অতঃপর দুআ ও নসিহত প্রদান করে দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির (সুরাট) চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ১৩৮৪ হিজরি সনে সেখানে উলইয়ার শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ সম্পন্ন হয়।

দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির এ নয় বছর অবধি খেদমত আনজাম দেন। এই নয় বছরে একদিকে আল্লাহপ্রদত্ত মেধা, দৃঢ় ইচ্ছা ও সঙ্কল্প, অবিরাম পরিশ্রম ও আল্লাহ পাকের বিশেষ তওফিকে অত্যন্ত সফলতার সাথে বিভিন্ন শাস্ত্র ও হাদিসের কিতাবাদির পাঠদান করেন। অপরদিকে উর্দু, আরবি ও গুজরাটি ভাষায় রচনা-সঙ্কলন ও প্রবন্ধ লেখার কাজ চলমান রাখেন। এভাবে সকল ময়দানে নিজেকে পাকাপোক্ত করে তুলেন। ফলে ইলমি ঘরানায় খ্যাতি ও ছাত্রদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা দিনদিন বৃদ্ধি পায়।

গ্রহণযোগ্যতা ও বিভিন্ন যোগ্যতার ভিত্তিতে দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক শুরা সদস্য হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনজুর নুমানি

রাহিমাহুল্লাহুর ইশারায় ১৩৯৩ হিজরি সনে মাদরে ইলমি দারুল উলুম দেওবন্দে নিয়োগ হয়। ফলে সেখানে নানাবিধ যোগ্যতার উন্নতিসাধনের ভরপুর সুযোগ মিলে। নিয়োগের সময় প্রিয় উসতাজ ও মুরব্বি আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহিম বিলয়াবি সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু যদিও জীবিত ছিলেন না[১] তবুও তার ভবিষ্যদ্বাণী নয় বছর পর বাস্তব প্রমাণিত হয়েছে।

হজরত মুফতি সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু জীবনের শেষমূহুর্ত অবধি দীর্ঘ ৪৮ বছরের সময়কাল মাদরে ইলমি দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে জড়িত থাকেন। ফিকহ, উসুলে ফিকহ, মানতিক, ফালসাফা, আকায়েদ, মুনাজারা, আদব, মিরাস, তাফসির, উসুলে তাফসির, হাদিস ও উসুলে হাদিসের বিভিন্ন পাঠ্য কিতাবাদি অত্যন্ত সফলতার সাথে পাঠদান করেন। ছাত্রদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা এতটাই বৃদ্ধি হয়েছিল যে, তিনি যে কিতাবের পাঠদান করতেন তালিবুল ইলমরা নিজেদেরকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করতেন।

দারুল উলুম দেওবন্দে পাঠদানের পাশাপাশি লেখালিখি অবিরাম রাখেন। দারুল উলুম দেওবন্দের মতো প্রতিষ্ঠানে মৌলিক ও কষ্টকর কিতবাসমূহের পাঠদানের পাশাপাশি লেখালিখি চালিয়ে যাওয়া সহজ বিষয় নয়, তবুও সঙ্কল্প ও দৃঢ় ইচ্ছার এই মূর্তমানব সক্ষিপ্ত সময়কালে ইসলামি কুতুবখানা এমন বিশাল কলেবর অনুসন্ধানী রচনাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, যা দেখে ইলম ও তাহকিকের সাথে সংশ্লিষ্টরা হতভম্ব হয়েছেন।

আকাবিরদের যুগ থেকেই মুসনিদুল হিন্দ হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহুর বেনোজির রচনা ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’র একটি তাহকিকি ও বিশদ ব্যাখাগ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব হচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা এই গুরুত্বপূর্ণ তাহকিকি কাজ বাস্তবে রূপান্তর করার জন্য হজরত মুফতি সাহেবকেই মনোনীত করেছিলেন। তিনি

---

[১]. ওফাত: ১৩৮৭ হিজরি।

‘রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ’ নামে বিশাল কলেবরে পাঁচ খণ্ডে একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন, যা ইলমি হালকায় বেহদ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

‘রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ শরহে ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’ ব্যাখ্যাগ্রন্থের গুরুত্ব বিবেচনায় দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শুরা (অনুষ্ঠিত ১৩-১৪ সফর ১৪২৫ হিজরি) একটি লিখিত প্রস্তাব পাস করে। এতে মুফতি সাহেবের এই ইলমি কৃতিত্বকে পুরো জামাতে দেওবন্দের পক্ষ থেকে ফরজে কেফায়া আদায়ের সমার্থক আখ্যায়িত করে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। অধমের অসম্পূর্ণ জ্ঞানানুসারে ইতিপূর্বে মজলিসে শুরা কারও কিতাবের ব্যাপারে লিখিত প্রস্তাব পাস করে অভিনন্দন জানায়নি।

তিনি ‘রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ’ ছাড়াও ‘তুহফাতুল আলমায়ি’ নামে বড় সাইজের আট খণ্ডে সুনানে তিরমিজির ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ‘তুহফাতুল কারি’ নামে বড় সাইজের বারো খণ্ডে সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং বড় সাইজের আট খণ্ডে ‘হেদায়াতুল কুরআন’ নামে কুরআনে কারিমের তাফসির লিখে প্রমাণ করেছেন যে, এই ফিতনা-ফাসাদের যুগেও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহি., আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহি. ও হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রাহি. -এর মতো লেখকদের পদাঙ্ক অনুসারী ও নিজেকে ইলমি ও তাহকিকি কাজে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

বিশাল কলেবরের এই রচনাবলী ছাড়াও জীবনের শেষদিকে হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রাহিমাহুল্লাহুর কালজয়ী তাফসির ‘বয়ানুল কুরআন’ -এর তাসহিলের পাণ্ডুলিপি আদ্যপ্রান্ত পুনঃনিরীক্ষণ করেন। তাসহিলকারী হজরত মাওলানা আকিদাতুল্লাহ কাসেমি সাহেব জিদা মাজদুহুর তামান্না ও দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হজরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি সাহেব মুদ্দা জিল্লুহুর পরামর্শে পাণ্ডুলিপি সোপর্দ করা হয়। তিনি আদ্যপ্রান্ত পুনঃনিরীক্ষণ করে কমবেশি, সহজিকরণ ও উপকারী সংযোজনা করেন।

অতঃপর ‘আসান বয়ানুল কুরআন’ নামে পাঁচ খণ্ডে নিজের প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করেন। এভাবে ‘বয়ানুল কুরআন’ বুঝা সহজ হয়ে যায়।
এ ছাড়াও বিভিন্ন ইলমি বিষয়ে রচনা করেছেন। সবমিলিয়ে সংখ্যা ছেচল্লিশে উপনীত হয়। সবগুলোই স্বস্থানে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর কয়েকটি দারুল উলুম দেওবন্দসহ হিন্দুস্তানের অনেক মাদরাসা ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তান (বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশসহ) এ পাঠভুক্ত। সাহেবজাদা দারুল উলুম দেওবন্দের ফাজিল ও জামেয়াতুশ শাইখ হুসাইন আহমাদ মাদানি দেওবন্দ -এর উসতাজে হাদিস, জনাব মাওলানা আহমাদ সাঈদ পালনপুরি জিদা মাজদুহুর বক্তব্য অনুযায়ী মুফতি সাহেবের রচনাবলীর পৃষ্ঠসংখ্যা তেত্রিশ হাজার ছয়শ' চৌরাশি।
হজরতুল উসতাজ মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর বিভিন্নরকম যোগ্যতা, ছাত্রদের মাঝে সীমাহীন গ্রহণযোগ্যতা, ইলমি হালকায় বেহদ ভালোবাসা এবং তাকওয়া ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে দারুল উলুম দেওবন্দের সম্মানিত ও ক্ষমতাশীল মজলিসে শুরা ১৪২৯ হিজরি সনে শাইখুল হাদিস ও সদর মুদাররিসের সর্বোচ্চ পদে তাকেই নির্বাচন করেন। সাবেক শাইখুল হাদিস ও সদরুল মুদাররিসিন হজরতুল উসতাজ মাওলানা নাসির আহমাদ খান সাহেব কুদ্দিসা সিররুহুর অসুস্থতা ও বৃদ্ধপনার কারণে অবসর গ্রহণের পর। মুফতি সাহেব রাহি. মৃত্যু (১৪৪১ হিজরি) অবধি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

این سعادت بہ زور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ
এই সৌভাগ্য বাহুর বলে অর্জন হয় না
যতক্ষণ আল্লাহ তাআলা দান করেন না

বৈশিষ্ট্যাবলী

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহুর সাথে অধমের সম্পর্ক বর্তমান শতাব্দীর শুরু (১৪০১ হিজরি) থেকে ওফাত (১৪৪১ হিজরি) অবধি পূর্ণ চল্লিশ বছর ব্যাপী। শুরুর এগারো বছর অধম তালিবে ইলম ছিলাম।

তারপর শিক্ষক ও মসজিদে কাদিমের ইমাম-খতিব। এ সময় হজরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ থেকে কদমে কদমে সরাসরি উপকৃত হয়েছি। অতঃপর মৃত্যু অবধি ঊনত্রিশ বছর দেওবন্দ থেকে করাচি স্থানান্তর হওয়ার কারণে সরাসরি ইসতিফাদার সুযোগ হাতছানি হলেও কয়েকবার খেদমতে উপস্থিতি ও সরাসরি উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে। বাকি আল্লাহর তওফিকে চিঠি-বিনিময় ও ফোনের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া এবং সময়ে সময়ে দিকনির্দেশনার ধারা অব্যাহত ছিল। তিনি অধমকে কখনও ইলমি ইফাদা ও উপকারী পরামর্শ থেকে মাহরুম করেননি।

আল্লাহ তাআলা এই দীর্ঘ সময় কাছ থেকে হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহুকে দেখার ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ভরপুর সুযোগ দান করেছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের অবগতি ও সুসম্পর্কের আলোকে অধম পূর্ণ আস্থার সাথে বলতে পারি যে, তার জীবনের প্রতিটি দিগন্তে জ্ঞানীদের জন্য মূল্যবান শিক্ষা, দিকনির্দেশনা ও অনুসরণযোগ্য; বরং ঈর্ষনীয় কার্যকরী কৃতত্বের নমুনা বিদ্যমান। পাঠকের উপকারার্থে অগণিত বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে কিছু লিপিবদ্ধ করছি।

পাঠদান ও রচনাকার্যে পরিপূর্ণ নিবিষ্টতা

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহুর একটি বিশিষ্টতা ছিল– পরিপূর্ণ নির্জনতা এখতিয়ার করতঃ মুতালাআ, পাঠদান, তাহকিক ও রচনার জন্য নিজেকে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। পাঠদান ও লেখালিখি ব্যাহত না হওয়ার জন্য অপ্রয়োজনীয় সাক্ষাৎ, সাধারণ মাহফিলে অংশগ্রহণ ও সবকের সময় ভ্রমণে অপারগতা প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন, সবকে একদিন অনুপস্থিতি চল্লিশ দিনের বরকম বিনষ্টকারী। এতদসত্ত্বেও বার্ষিক ছুটিতে এমন প্রবাসী মুসলমানদের অনুরোধে বরাবর সফর করতেন, যারা হজরতওয়ালার আত্মশুদ্ধিমূলক ও ইলমি আলোচনাকে নিজেদের ও প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত দামী ও জরুরি মনে করতেন। তিনি তাদের আকিদা ও আমলের শুদ্ধির লক্ষ্যে অতি সাধারণ ভাষায় কিন্তু দালিলিক আন্দাজে বয়ান করতেন, যা তারা অমুসলিম দেশে বসবাস করা সত্ত্বেও

নিজেদের কর্মপদ্ধতি ঠিক করতে এবং আকিদা ও আমলের হেফাজত করতে বড়ই সহযোগী প্রমাণিত হত। আলোচনা সাধারণ বক্তাদের ন্যায় তেজস্বী ছিল না; বরং পাঠদানের আন্দাজে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার ওপর ভিত্তিশীল ও ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন ও আকাবিরে দেওবন্দের ব্যাখ্যার মোতাবেক ছিল।

অধম নিজের জীবনে এমন দুজন ব্যক্তিত্ব দেখেছি, যাদের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও উচ্চ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন হওয়া সত্ত্বেও ইলমি ও তাহকিকি কাজে ব্যাঘাত ঘটেনি। নিজেরাও ইলমের বাইরের ব্যবস্ততা থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছেন। তাদের একজন হলেন, বিশিষ্ট আলেমে দীন ও মুহাদ্দিসে কাবির হজরতুল উসতাজ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ হালবি শামি কুদ্দিসা সিররুহু। অধম তার কাছে "জামিয়াতুল মালিক সউদ রিয়াদ, সৌদি আরব" এ পড়েছি। অপরজন হলেন, হজরতুল উসতাজ মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি (আল্লাহ পাক তার কবরকে শীতল করুক)। অধম তার কাছে দারুল উলুম দেওবন্দে পড়েছি এবং মৃত্যু অবধি দীর্ঘদিন ইসতিফাদা করেছি।

সাধারণত বর্তমান যুগে দেখা যায় যে, জ্ঞানী ব্যক্তির খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন হয়ে গেলে এবং দেশ-বিদেশে প্রচুর ভক্ত তৈরি হয়ে গেলে ভক্তদের অনুষ্ঠানাদী ও মাহফিলে অংশ্র গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করা বা আমন্ত্রণে ভ্রমণ থেকে বিরত থাকা বা ধর্মীয় ও ইলমি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদের প্রস্তাব নাকচ করা বিশাল পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর অধিকাংশই পাঠদানের বাইরের কাজে যুক্ত হয়ে যান। ফলে ইলমি ও তাহকিকি কাজের গতিতে উন্নতির পরিবর্তে অলসতা সৃষ্টি হয়। অবশ্য কিছু লোক এতটা হিম্মত ও সঙ্কল্পের অধিকারী। তারা নিজেদের ইলমি ও তাহকিকি ব্যস্ততায় এতটা নিবিষ্ট হন যে, ইলমি ব্যস্ততার মোকাবেলায় কোন ধরনের লিপ্সা ও স্বার্থের শিকার হতে হয় না। অধমের দৃষ্টিতে হজরতুল উসতাজ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ

রাহিমাহুল্লাহ ও হজরতুল উসতাজ মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হিম্মত ও অবিরাম মেহনত

হজরতওয়ালা কুদ্দিসা সিররুহুর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট ছিল– অবিরাম মেহনত ও অস্বাধারণ সঙ্কল্প-হিম্মত। একদিকে দারুল উলুম দেওবন্দে সফল ও গ্রহণযোগ্য শিক্ষক হিসাবে বিভিন্ন কিতাবের পাঠদান। অবশেষে শাইখুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষকের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া। অপরদিকে সন্তানদেরকে নিজেই হিফজে কুরআন, প্রাথমিক কিতাবাদির শিক্ষা ও হস্তলিপির অনুশীলন করানো। আল্লাহর অনুগ্রহে সন্তানাদির সংখ্যা এক ডজনের বেশি। পাশাপাশি তিনি সর্বমোট তেত্রিশ হাজার ছয়শ' চৌরাশি পৃষ্ঠা ব্যাপী ইলমি ও তাহকিকি ছেচল্লিশটি কিতাব রচনা করেছেন। উপরিউক্ত সকল ব্যস্ততার পাশাপাশি ছুটির দিনগুলোতে সাধারণ মুসলমানদের আত্মশুদ্ধির জজবা অন্তরে নিয়ে দেশ-বিদেশে ইসলাহি বয়ান দিয়েছেন। এ থেকে অগণিত বিশেষ ও সাধারণ শ্রেণীর মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

মূলত এ সমস্ত ইলমি কৃতিত্ব ধর্মী শাস্ত্রের সাথে অন্তরে দোলায়িত সত্যিকার ভালোবাসার কারিশমা ছিল। এটি এমন ভালোবাসা, যা গন্তব্যের দিকে রওনা করে না শুধু রাস্তার ক্লেশসমূহ বরদাশত করত; বরং ক্লেশকেও গন্তব্যের অংশ মনে করত। এমন মহব্বতের ব্যাপারে কবি বলেছিলেন–

رہ رواں را خستگی راہ نیست * عشق خود راہ است ہم خود منزل است

"গন্তব্যের দিকে রওনাকারী পথিক রাস্তার কষ্টে পেরেশান হয় না
সত্যিকার মহব্বতের দৃষ্টিতে গন্তব্যের পথও গন্তব্যের মতো আকর্ষণীয়।"

মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর সমস্ত রচনাবলী প্রকাশিত না হলে এবং অদ্যাবধি (শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি) বিভিন্ন ইলমি ব্যস্ততা স্বচক্ষে অবলোকনকারী অগণিত লোক না থাকলে হয়তোবা পাঠকদের সংশয় সৃষ্টি হত যে, প্রবন্ধকার ভক্তির ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়েছে। কারণ, বাহ্যিক

দৃষ্টিতে আরাম ও বিলাসিতার এ যুগে একই সাথে এত কাজ আনজাম দেওয়া অসম্ভব।

আমি তার ইলমি ব্যস্ততা ও মেহনতের বিষয়ে চিন্তা করলে অনুভূত হয় যে, সত্যিই তিনি বিশুদ্ধ অর্থে এই বাক্যের চাহিদা পূরণ করেছেন–

اَلعِلْمُ لَا يُعْطِيْكَ بَعْضَهُ حَتّٰى تُعْطِيَهُ كُلَّكَ.

অর্থাৎ ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই দিবে না যতক্ষণ নিজের সম্পূর্ণ তার জন্য বিলীন করবে না।

সাধারণত মানুষ তালিবে ইলমকে এই বাণীর প্রত্যয়ন আখ্যা দিয়ে থাকেন, অথচ হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহ নিজের কর্ম দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, স্বয়ং শিক্ষকও এই বাণীর প্রত্যয়ন।

জ্ঞানসাধনায় আত্মত্যাগের একটি ঘটনা

মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর দৃঢ় ইচ্ছা, হিম্মত ও জ্ঞানার্জনে আত্মত্যাগের একটি ঘটনা মনে পড়ল– একবার অধম তার অনুমতি নিয়ে ব্যক্তিগত কুতুবখানায় মুতালাআ করছিলাম। এমতাবস্থায় একটি জীর্ণশীর্ণ কিতাব বের করলাম। প্রথম পৃষ্ঠায় হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহুর হাতে ছাত্রজীবনের একটি বাক্য লেখা ছিল। মর্মার্থ এরকমই ছিল– "মুহতারামা আম্মাজান একজনের মাধ্যমে আমার জন্য ঘি পাঠিয়েছিলেন; আমি তা বিক্রি করে কিতাবটি সংগ্রহ করেছি।"

আল্লাহু আকবার! চিন্তা করুন– বর্তমানে অনেক তালিবে ইলমের কাছে কিতাব ক্রয়ের জন্য বাড়ি থেকে টাকা পাঠালে খানাপিনায় ব্যয় করে ফেলে। কিন্তু হজরত মুফতি সাহেব ছাত্রজীবনে মায়ের পাঠানো বিশুদ্ধ খাবারের বস্তু বিক্রি করে বই সংগ্রহ করেছেন। "উভয়ের মাঝে আসমান-জমিনের পার্থক্য।"

বোঝানোর স্বতন্ত্র পদ্ধতি

অধম প্রবন্ধকারের অযোগ্যতা ও সম্বলহীনতার পূর্ণ অনুভূতি ও স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও ভাগ্যের ব্যাপার যে, আল্লাহ তাআলার তওফিকে বান্দা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে চারটি দেশের (আফগানিস্তান, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান ও সৌদি আরব) এমন কিছু গর্বিত বিদ্যানদের থেকে উপকৃত হয়েছি; পাঠগ্রহণ

করেছি, যাদের দিকে সম্বন্ধিত হওয়া সৌভাগ্য ও গর্বের বিষয়। এই প্রশস্ত অবগতির ভিত্তিতে (যা আমার ব্যক্তিগত পূর্ণাঙ্গতা নয়) নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, হজরতওয়ালার বোঝানোর পদ্ধতি তাদের সকল থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। তিনি কঠিন থেকে কঠিন আলোচনা এতটা বিন্যস্ত ও উৎকৃষ্ট পন্থায় উপস্থাপন করতেন যে, মেধাধী তো বটেই অতি গবেট তালিবুল ইলমের জন্য বোঝা সহজ হয়ে যায়। আমার স্মরণ আছে– কখনও তিনি অন্যান্য আসাতিজায়ে কেরামের সফরের কারণে লাগাতার দুই-তিন ঘণ্টা দারস দিতেন। সমস্ত ছাত্ররা মনোযোগী হয়ে শুনতেন। তারা "যেন মাথায় পাখি বসা" -এর প্রত্যয়ন হয়ে হজরতওয়ালার ইলমি তাহকিক থেকে নিবিষ্টতার সাথে অবিরাম কয়েক ঘণ্টা উপকৃত হতেন।

দীক্ষা ও রিজাল তৈরি

হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহুর দীক্ষাদান ও রিজাল তৈরির স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিল। তাকে সর্বদা ইলমি, তাসনিফি ও ইসলাহি কাজে লিপ্ত থাকতে এবং অপ্রয়োজনীয় দেখা-সাক্ষাৎ থেকে বহুদূরে দৃষ্টিগোচর হত। শাগরেদ ও নিকটবর্তীদেরকেও এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন।

گرت ہوا است کہ بہ خضر ہم نشیں باشی
نہاں ز چشم سکندر چو آب حیوان باش

"খিজিরের (হক ও আহলে হকের) সহচর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকলে
সিকান্দারের (দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীর) দৃষ্টি থেকে আবে হায়াতের ন্যায় লুক্কায়িত থাকবে।"

প্রবন্ধকার দারুল উলুম দেওবন্দে অবস্থানকালে বিষয়টা প্রত্যক্ষ করেছি। হজরতওয়ালা রাহিমাহুল্লাহুর সাথে যে সকল শিক্ষক বা ছাত্রদের নৈকট্য ও সম্পর্কের সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উন্নতি দান করেছেন। তাদেরকে অমুখাপেক্ষিতা, ইলমি নিবিষ্টতা, উচ্চ হিম্মত ও দুনিয়ার কণ্টকযুক্ত উপত্যকাসমূহ অতিক্রম করার যোগ্যতা দান করেছেন।

উদাহরণ হিসাবে হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহুর রিজাল তৈরির কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

রিজাল গড়ার প্রথম ঘটনা

১৪০২-১৪০৩ হিজরি শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি সময়ে দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষক হিসাবে অধমের নিয়োগ হয়। তৎকালীন শিক্ষাসচিব হজরতুল উসতাজ মাওলানা রিয়াসত আলি সাহেব বিজনুরি রাহিমাহুল্লাহ প্রদত্ত কিতাবাদির ব্যাপারে মতামত জানতে শিক্ষাদপ্তরে তলব করেন। আমি ছিলাম নতুন ফারেগ। পাঠদানের ময়দানে আগন্তুক জটিলতার বিষয়ে অনুমান বা অভিজ্ঞতা ছিল না। বয়সও ছিল বিশের কাছাকাছি। এদিকে দেমাগে হয়তো এই অহমিকা ছিল যে, আমি তো দাওরায়ে হাদিসে প্রথম স্থান অর্জন করেছি এবং দারসে নেজামির বাইরে মানতিক, ফালসাফা ও অন্যান্য শাস্ত্রের এমন কিতাবসমূহ নিজ এলাকার যোগ্য আলেমদের কাছে পড়েছি, যা আজকাল কমই পড়ানো হয়। সুতরাং দারসে নেজামির একটি কিতাবও আমার জন্য কঠিন হবে না, ইনশাআল্লাহ।

অনভিজ্ঞতা; বরং অজ্ঞতাপূর্ণ এই অহমিকার আলোকে হজরত বিজনুরি রাহিমাহুল্লাহুকে আরজ করে বসি– হজরত! যে কিতাবই সোপর্দ করবেন; পড়াতে পারব, ইনশাআল্লাহ। নিচের জামাতের কিতাবের কারণে ভেঙ্গে পড়ব না এবং না উপরের কিতাবের কারণে ঘাবড়ে পড়ব।

উত্তর শুনে বিজনুরি রাহিমাহুল্লাহ 'মুল্লা হাসান', 'মাইবুজি'সহ আরও দুটি কিতাব (নাম মনে নেই) আমার জিম্মায় দিয়ে নোট করলেন, যাতে পরে ঘোষণা দিতে পারেন। আমি মনে মনে আনন্দিত হচ্ছিলাম যে, শুরু থেকেই আমার উন্নতি হচ্ছে! ঘটনাক্রমে এমন সময় অফিসে আসেন হজরতুল উসতাজ মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ। আমাকে শিক্ষাসচিবের কাছে দেখে অনুমান করলেন যে, সবকের ব্যাপারেই তিনি আমাকে তলব করেছেন। শিক্ষাসচিব সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কী কী কিতাব দিয়েছেন? বললেন, মতামত

নিয়েই এগুলো দিয়েছি। শুনে মুফতি সাহেব কঠোরতার সাথে দ্বিমত পোষণ করে বললেন, এখনই এগুলো তাকে দিয়েন না। অন্যাথায় সামনে সে যোগ্য শিক্ষক হতে পারবে না। এখন প্রথম বর্ষে 'নাহবেমির', দ্বিতীয় বর্ষে 'ইলমুস সিগা', তৃতীয় বর্ষে 'শরহে তাহজিব' এবং চতুর্থ বর্ষে 'উসুলুশ শাশি' বা 'সুল্লামুল উলুম' তাকে সোপর্দ করা উচিত।

অতঃপর আমাকে বললেন, "মৌলভি সাহেব! দুটি কথা উপলব্ধি কররে। **এক.** কিতাব বোঝা। **দুই.** বোঝানো। কিতাব বোঝানোর জন্য শুধু বোঝা যতেষ্ট না; বরং শিক্ষককে প্রচুর মেহনত ও প্রাথমিক স্তরে পড়ানো আবশ্যক। এমনটা করলে ভবিষ্যতে যোগ্য শিক্ষক হবে। তোমার ধারণা– "যে কিতাব আমি বোঝি তা ছাত্রদেরকে সহজে বোঝাতে পারব" সম্পূর্ণ গলদ।

শিক্ষাসচিব সাহেব সবসময় মুফতি সাহেবের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। সুতরাং তার সাথে সহমত পোষণ করে তার বাতলানো কিতাবাদি আমার নামে লিখে নেন।

আমারও নিজের অনভিজ্ঞতার উপলব্ধি হল এবং তাদের উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত কিতাবগুলো নিজের জন্য সৌভাগ্যের মনে করে পাঠদান শুরু করি। সবক শুরুর পর দ্রুতই অনুভব হল যে, মুফতি সাহেবের পরামর্শ আমার জন্য অত্যন্ত উপকারী ছিল। সত্যিই শূন্যমনা ছাত্রদের বোঝানোর জন্য বড়ই মেহনত ও প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, শুরুতেই উপরের কিতাবাদি গ্রহণ করলে বড় ধরনের জটিলতায় ফেঁসে যেতাম।

মানুষ গড়ার জন্য উপকারী এই নসিহত ও পরামর্শের ফায়দা এখনও উপলব্ধি করছি। এরই আলোকে বছরের শেষদিকে ফারেগ ছাত্রদেরকে পরামর্শ প্রদান করি যে, যোগ্য শিক্ষক হতে চাইলে প্রাথমিক কিতাব দ্বারা পাঠদানের সূচনা করুন এবং পরে ধীরে ধীরে উপরে উঠার চেষ্টা করুন। শুরু থেকেই উপরের কিতাব গ্রহণের চেষ্টা করলে গ্রহণযোগ্য শিক্ষক হতে পারবেন না।

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি রাহি. চমৎকার বলেছেন–

مرغ پرنارستہ چوں پراں شود

طعمہ ہر گربہ دراں شود

"ডানা গজানোর আগে যে পাখিছানা উড়ার চেষ্টা করে
সে নখর বিড়ালের খোরাক বনে।"

দ্বিতীয় ঘটনা

দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষক হিসাবে অধমের নিয়োগের পরের ঘটনা। একবার পরীক্ষার হলে (দারুল হাদিস নিচতলা) লিখিত পরীক্ষা চলছিল। আসতিজায়ে কেরাম নেগরানি করছিলেন। আমিও এক হালকার দায়িত্বে ছিলাম। নিজের হালকায় দেখলাম যে, দুইজন পরীক্ষার্থী পরস্পর কথোপকথন করছেন। আমি অনভিজ্ঞতা ও স্বভাবগত গোস্সার বশবর্তী হয়ে কঠিন ভাষায় তাদেরকে ধমকি দিলাম। ধারণাই ছিল না যে, বিষয়টি হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহ প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি অন্য হালকায় চক্কর দিচ্ছিলেন। তিনি দূরদর্শী চক্ষু দিয়ে দেখে ফেলেন। অতঃপর ধীরে ধীরে আমার হালকার দিকে তাশরিফ আনেন। আমাকে একদিকে ডেকে নিয়ে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসটি শুনান, যা ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ সনদসহ হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন–

إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَه وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَه.

"কোন বস্তুতে নম্রতা অন্তর্ভুক্ত হলে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় এবং বস্তু থেকে নম্রতা দূর করা হলে তা ত্রুটিযুক্ত হয়।"

হাদিসটি শুনিয়ে হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দেখুন! এ কথা স্বস্থানে সঠিক যে, ছাত্রদের অন্তরে উসতাজের ভয় ও গাম্ভীর্য থাকবে। তিনি ছাত্রদের সাথে এতটা অপেন হবেন না, যদ্দারা ভয় ও স্থৈর্য বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু এও মনে রাখা উচিত যে, অপ্রয়োজনীয় রূঢ়তা বা কঠোর

আচরণ করা পরস্পর ঐ স্নেহ-ভক্তির বন্ধনের জন্য ক্ষতিকর, যা অটুট থাকা জরুরি। বিপরীতে নম্রতা ও অনুগ্রহপ্রদর্শন বন্ধন আরও মজবুত করে।

প্রবন্ধাকারের মেজাজ জন্মগত কিছুটা কঠোর। অবশ্য হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহুর নসিহতের প্রভাব অদ্যাবধি অনুভব করি। কোন বিষয়ে মেজাজ তীব্র হতে লাগলে নসিহতের কথা মনে পড়ে এবং নম্রতা এখতিয়ারের চেষ্টা করি। যথাসময়ে নম্রতা গ্রহণ করতে না পারলেও পরে অনুশোচনা অবশ্যই হয়, যা ভবিষ্যতে নম্রতা এখতিয়ারের মাধ্যম বনে।

তৃতীয় ঘটনা

দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যান্য আসলাফ-আকাবিরের ন্যায় হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহুর দীক্ষাদান ও রিজাল তৈরির অবস্থা ছিল যে, ছাত্রদের লুক্কায়িত যোগ্যতা বের করে উৎসাহপ্রদান ও যোগ্যতাসম্পন্ন বানানোর চেষ্টা করতেন।

দারুল উলুম দেওবন্দে অধমের নিয়োগের পর নিয়মানুযায়ী পাঠদানের পাশাপাশি দারুল ইকামার একটি হালকার দায়িত্ব আমাকে সোপর্দ করা হয়। কিছুদিন পর নিজের হালকার কিছু ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দীর্ঘ একটি পত্র তৎকালীন মুহতামিম হজরত মাওলানা মারগুবুর রহমান সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর নামে লিখি। আমার উর্দু ভাষা যতেষ্ট দুর্বল হওয়ায় ত্রুটিপূর্ণ লিখনের ওপর মনে মনে লজ্জাবোধ করছিলাম যে, না জানি পত্রের উদ্দেশ্য মুহতামিম সাহেবের কাছে সুস্পষ্ট হবে কিনা?

অতঃপর দ্বিধাবোধের মধ্যেই পেশকারের কাছে পত্র জমা করি। তিনি উপযুক্ত সময়ে মুহতামিম সাহেবের খেদমতে পেশ করবেন।

ঘটনাক্রমে মুহতামিম সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর সামনে পত্র পেশ করার সময় হজরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহু উপস্থিত ছিলেন। তিনিও পত্র দেখেছেন। অবশ্য বিষয়টি আমি জানতাম না। কিছুদিন পর উপযুক্ত সময়ে মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, তোমার মাঝে লেখালিখির যোগ্যতা আছে; একে কাজে লাগিয়ে কিছু লিখতে শুরু কর। আমি শুনে হতভম্ব হয়ে যাই যে, আমি অদ্যাবধি না বই লিখেছি, না আছে

প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখার আকর্ষণ এবং না নিজের মাঝে লেখার হিম্মত অনুভব করি। জানি না কীসের ভিত্তিতে যোগ্যতার কথা বলছেন? এই ভাবনায় থাকতেই পরের বাক্য বললেন, কিছুদিন পূর্বে দারুল ইকামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মুহতামিম সাহেবের নামে যে পত্র লিখেছিলেন তা তিনি আমাকে দেখিয়েছেন। সেখান থেকে অনুমান হয় যে, আপনার মাঝে লেখার যোগ্যতা আছে। সুতরাং এই যোগ্যতা বিনষ্ট হতে দিবেন না।

নিজের গাফিলতির দরুন যদিও এই মূল্যবান উপদেশের ওপর পরিপূর্ণরূপে আমল করতে পারিনি তবুও এর বরকতে এতটা হিম্মত অবশ্যই অনুভব করি যে, অদ্যাবধি আল্লাহর তওফিকে আরবি-উর্দু ভাষায় কিছু লেখার সুযোগ হয়েছে।

দীনি গোস্‌সা ও সত্যকথন

সুবিধাবাদের এ যুগে দীনি তেজ ও সত্যকথন ছিল হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহুর অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি শরিয়তের খেলাপ আমলের ক্ষেত্রে চুপ থাকতে পছন্দ করতেন না। আধুনিক যুগের চাহিদার বাহানায় আকাবিরদের মাসলাক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কারও বক্তব্য সামনে এলে জোরালভাবে দলিলভিত্তিক খণ্ডন করতেন। ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সমাবেশে ছবি তোলার মাসআলা হোক বা প্রাণীর ছবির সাথে সোস্যাল মিডিয়া বা টিভিতে দীন প্রচারের মাসআলা। কবরে নেমপ্লেট লাগানো বা মাদারেসে দীনিয়ায় প্রচলিত ‘হিলায়ে তামলিক’ (জাকাত হালাল করার অপকৌশল) -এর মাসআলা হোক। অথবা এমন মাসআলা, যাতে কুরআন-সুন্নাহ ও আকাবিরের মাসলাক থেকে দূরে গিয়ে শিথিলতা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি সকল স্বার্থ পিছনে ফেলে দলিলের আলোকে এসব বিষয়ের ঘোর বিরোধিতা করতেন। কিছু মতামতের সাথে কিছু উলামায়ে কেরাম একমত না হতে পারলেও স্বীকার করতেন যে, তিনি সত্যবাদী ও সুস্পষ্টবাদী আলেমে দীন ছিলেন। যা বলতেন দীনি তেজের অধীনেই বলতেন।

সারকথা, সত্যকথনে তিনি প্রচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল রাহিমাহুল্লাহুর এই কবিতার প্রত্যয়ন ছিলেন–

آئین جواں مرداں حق گوئی وبے باکی

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

বীর পুরুষের জন্য সত্যকথন ও নির্ভীকতা আবশ্যক
আল্লাহর সিংহরা শিয়ালের মতো ভীরু হয় না

অধমের প্রতি অগণিত অনুগ্রহ

বর্তমান পনেরো হিজরি শতাব্দীর প্রথম বছর তথা ১৪০১ হিজরি সনে অধম অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দারুল উলুম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদিসে ভর্তি হই। বাহ্যিক অভাব-অনটন, বিনদেশি ও স্থানীয় ভাষা সম্পর্কে অনবগতি সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা এত অনুগ্রহ করেছেন, যা অধমের মতো নিস্ব ও অযোগ্য তালিবে ইলম কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহ পাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুগ্রহ ছিল যে, তিনি আসাতিজায়ে কেরাম বিশেষত হজরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর বিশেষ স্নেহ আমার দিকে অভিমুখ করে দিয়েছেন।

হজরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ যেখানে দারুল হাদিসে অন্যান্য ছাত্রদের সাথে অধমকে হাদিসের বিভিন্ন কিতাবের পাঠদান করেছেন, সেখানে খারেজি সময়ে রুটিন অনুযায়ী অধমকে খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসতিফাদার বিশেষ অনুমতি প্রদান করেন। মুতালাআয় সৃষ্ট জটিলতা খেদমতে পেশ করতাম। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং প্রশান্তিমূলক জবাব দিয়ে ধন্য করতেন।

তর্জনী দ্বারা ইশারা করার মাসআলায় রাহনুমায়ি

অধম ফিকহের কিতাবসমূহ নিজের এলাকার উলামায়ে কেরামের কাছে পড়েছি। তারা তাশাহুদের সময় তর্জনী দ্বারা ইশারা করার প্রবক্তা না। তারা দলিল হিসাবে কিছু হানাফি ফকিহদের বক্তব্য এবং হজরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি শায়খ আহমাদ সারহিন্দি রাহিমাহুল্লাহুর একটি

সুদীর্ঘ পত্র পেশ করতেন, যাতে তর্জনী দ্বারা ইশারা করার হাদিসের আলোকে ফিকহে হানাফির বিভিন্ন কিতাবের হাওলাসহ ইশরা করতে নিষেধ করা হয়েছে।[২]

অধম দারুল উলুম দেওবন্দে যাওয়ার পূর্বে মাওকুফ আলাইহি জামাত পড়াকালে মিশকাত শরিফের দারসে উসতাজের কাছে তর্জনী দ্বারা ইশারা করার হাদিস পড়েছি। উসতাজ এই হাদিসের আলোকে তর্জনী দ্বারা ইশারা করাকে সুন্নাত আখ্যা দিয়েছেন। আমি ছাত্রসুলভ ইশকাল উত্তাপন করি। মুজাদ্দিদে আলফেসানি রাহিমাহুল্লাহুর উক্ত পত্র ও ফিকহের হাওলা পেশ করে উসতাজে মুহতারামের কাছে জবাব জানতে চাই। তিনি জবাব দিতে ও আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জবাব আমার মনে অতিরিক্ত জটিলতা সৃষ্টি করে। যদ্দূর মনে পড়ে, প্রশ্নত্তোরের এই পর্ব কয়েকদিন অবধি চলমান ছিল। কিন্তু আমার মাহরুমি ছিল যে, আশ্বস্ত হতে পারিনি।

পরের বছর দারুল উলুম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদিসের তালিবে ইলম হিসাবে অধমের দাখেলা হয়। সেখানকার গর্বিত মুহাদ্দিসিনের কাছে হাদিস পড়ার সৌভাগ্য অর্জন হয়। হজরতুল উসতাজ মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহু হাদিসের বিভিন্ন কিতাবের পাঠদান করতেন। মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর কাছে প্রথমবার তর্জনী দ্বারা ইশারার হাদিস পড়লে এখানেও মুজাদ্দিদে আলফেসানি রাহিমাহুল্লাহুর পত্রের সূত্রে অভিযোগ উত্তাপন করি। হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহু মাসআলাকে ব্যাখ্যাযোগ্য আখ্যা দিয়ে দারসের পর বাসভবনে যেতে নির্দেশ দেন।

অতঃপর নির্ধারিত সময়ে অধম খেদমতে হাজির হই। তিনি শান্তমনে আমার অভিযোগ শুনেন এবং নিজের আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা ও বেনোজির বোঝানোর পদ্ধতির মাধ্যমে মুহাক্কিক হানাফিদের ও আকাবির উলামায়ে

---

২. মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানি, মাকতুব নম্বরঃ ৩১২।

দেওবন্দের মাসলাক বর্ণনা করেন। উপরিউক্ত পত্রের এমন মুহাক্কিকানা উত্তর প্রদান করেন, যদ্দারা অন্তর বিলকুল আশ্বস্ত হয়ে যায়। এখানেই শেষ নয়; বরং পরবর্তী নামাজে তর্জনী দ্বারা ইশারা করার সুন্নাহর ওপর আমল করতে শুরু করি। অতঃপর আল্লাহর তওফিকে নিজের এলাকার অগণিত মানুষকে এই সুন্নাহর ওপর আমল করার প্রতি উৎসাহিত করি। আজও এই চেষ্টা অব্যাহত।

ইমামতি ও শিক্ষকতায় দিকনির্দেশনা

দাওরায়ে হাদিসের বছর অধমকে দারুল উলুম দেওবন্দের মসজিদে ইমামতি ও খেতাবতির জিম্মাদারি সোপর্দ কর হয় এবং ফারেগ হওয়ার পর শিক্ষকতার জিম্মাদারি। এই দুই ময়দানে সমস্ত আসাতিজায়ে কেরামের বিশেষত হজরতুল উসতাজ মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর কদমে কদমে রাহনুমায়ি ছিল। তাদের বিশেষ দৃষ্টি ও স্নেহের বদৌলতে আমার মতো গাফিল ও অযোগ্য ব্যক্তি নাহবেমির থেকে পাঠদানের সূচনা করে সামনে অগ্রসর হতে থাকি এবং আজ দাওরায়ে হাদিসের কিতাবসমূহের পাঠদান করছি। পাশাপাশি বড় একটি মসজিদে ইমামতি ও খেতাবতির জিম্মাদারি আদায় করেছি। তাদের বিশেষ দেখাশুনা, দৃষ্টি ও বরকতময় দুআ না থাকলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলো সম্ভব না।

হিফজে কুরআনের ক্ষেত্রে অধমের ওপর বিরাট অনুগ্রহ

পূর্বে বলা হয়েছে যে, ফারেগ হওয়ার পর দারুল উলুম দেওবন্দেই শিক্ষক হিসাবে অধমের নিয়োগ হয়। অধম পাঠদানকালে অনুভব করি যে, হাফেজে কুরআন না হলে পাঠদানে জটিলতার মুখামুখী হতে হচ্ছে। এছাড়া দারুল উলুমের পরিবেশে কুরআনের হাফেজদের আধিক্যতা দেখে হিফজে কুরআনের স্পৃহা অন্তরে সৃষ্টি হয়।

সুতরাং মনস্থ করলাম, পাঠদান, দারুল উলুমের মসজিদে ইমামতি ও দারুল ইকামার এক হালকার নেগরানির পাশাপাশি অবসর সময়ে কুরআন মুখস্থ করে ফেলব। উপরিউক্ত কর্মব্যস্থতার পাশপাশি কুরআন

হিফজ শুরু করা সহজ বিষয় ছিল না। অতএব, নিয়মানুযায়ী পরামর্শের জন্য হজরতুল উসতাজ মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর বাসভবনে ছুটে যাই এবং এ ব্যাপারে আগ্রহ ও ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করি।

হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহু উৎসাহপ্রদান করতঃ আমার অভিলাষ সমর্থন করলেন। বললেন, চিন্তাধারা অনেক ভালো। কিন্তু এই বয়সে এত ব্যস্ততার মাঝে হিফজে কুরআনের জন্য শক্ত রুটিন বানানো, অবিরাম মেহনত ও সময়ের পাবন্দির অত্যন্ত প্রয়োজন। উপরিউক্ত তিন শর্তের ওপর আমল করতে প্রস্তুত থাকলে আমি নিজে দৈনন্দিন নির্ধারিত সময়ে সবক ও আমোখতা শুনব এবং আল্লাহর তওফিক হলে তোমাকে কুরআনের হাফেজ বানিয়ে দেব।

আমি শুধু পরমর্শের উদ্দেশ্যে হজরতওয়ালার খেদমতে গিয়েছিলাম। অন্তরের গহীনেও ছিল না যে, দারুল উলুমের গর্বিত উসতাজে হাদিস নিজের বিভিন্ন ইলমি ব্যস্ততা সত্ত্বেও অধমকে সন্তানের মর্যাদা দিয়ে প্রতিদিন সময় দিবেন। আরজ করলাম, হজরতওয়ালা! আমি তো শুধু পরামর্শের জন্য হাজির হয়েছি, কিন্তু এত বিরাট অনুগ্রহের আচরণ করলেন, যা কল্পনায়ও ছিল না।

অতএব, আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আল্লাহর তওফিকে তিন শর্তেরই পরিপূর্ণ পাবন্দি করব। হজরত বললেন, যাও আজ থেকে কুরআনের শেষ মঞ্জিল সুরা 'কাফ' থেকে মুখস্থ শুরু কর এবং আগামীকাল অমুক সময়ে এক মিনিটও কমবেশি না করে আসবে; আমি সবক শুনব।

হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহুর নির্দেশনা মোতাবেক রবিবার ২৮ সফর ১৪০৪ হিজরি মোতাবেক ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে হিফজ শুরু করি। অতঃপর আল্লাহর তওফিকে এবং হজরতুল উসতাজের বিশেষ দৃষ্টি ও অনুগ্রহে বিভিন্ন ব্যস্ততা সত্ত্বেও একবছর তিনমাসে সোমবার ১১ জুমাদাল উখরা ১৪০৫ হিজরি মোতাবেক ৪ মার্চ ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে হিফজে

কুরআন সমাপ্ত করি। এই পূর্ণ সময়ে হজরতকে প্রতিদিন বাদ ফজর সবক এবং সন্ধায় আমোখতা শুনাতাম। জুমুআর দিনও বাদ যেত না। কুরআনের এক মন্জিল মুখস্থ হওয়ার পর জুমুআর দিনে সবক ছাড়া পূর্ণ এক মন্জিল শুনতেন।

এই দীর্ঘ সময়ে অধম অনুভব করলাম যে, হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুন বিস্বাদ প্রকাশ করেননি; বরং হিফজ সম্পন্নের পরেও অধমের প্রতিনিয়ত দেড় পারা এবং পরে দুই পারা শুনতেন। ১৪০৫ হিজরির রমজানের আগে তিনবার শুনে আমাকে এতটুকু উপযুক্ত বানিয়ে দিয়েছেন যে, সে বছর রমজানে তারই পরামর্শে প্রথমবারের মতো দারুল উলুমের মসজিদে কুরআন শুনাই। রমজানের পর প্রতিদিন দেড় পারা অতঃপর তিন পারা করে শুনতেন। শেষ পর্যন্ত রবিবার ৪ সফর ১৪০৬ হিজরি মোতাবেক ২০ অক্টোবর ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বললেন, এখন ইনশাআল্লাহ আর শুনানোর প্রয়োজন নেই। তুমি প্রতিদিন রুটিন বানিয়ে সারাজীবন কুরআন তিলাওয়াতের সাথে জুড়ে থাকবে এবং রমজানে তারাবিতে শুনানোর পাবন্দি করতে থাকবে।

পাকিস্তান প্রত্যবর্তনের পর কদমে কদমে রাহনুমায়ি

দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের পর পাঠদানের বিষয়ে বা ইমামতির, নিজের জীবনের উপযুক্ত কর্মপদ্ধতির তালাশে বা ইলমি বিষয়ে, অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিভ্রান্তির মুখামুখী হলে বা জীবনের উত্থান-পতনে জটিলতা সৃষ্টি হলে, পড়ালেখার পদ্ধতি বা কিতাব প্রকাশের বিষয়ে। সর্বাবস্থায় অধম হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহুর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। তিনি দিকনের্দেশনা দিতেন। হজরতওয়ালার পরামর্শ এমন হয়েছে বলে আমার মনে নেই, যাতে আমি আশ্বস্ত হইনি বা পরিণতি ইতিবাচক হয়নি।

ইনতিকালের পর আমিসহ দারুল উলুম দেওবন্দের অগণিত হিতৈষী চিন্তিত হয়েছেন যে, এখন মাদরে ইলমি এমন জামেউল মাকুল ওয়াল মানকুল (বর্ণনাভিত্তিক ও বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয়ক) শাইখুল হাদিস এবং

এমন মুত্তাকি ও হিম্মতবান সদরুল মুদাররিসিন পাবে কোথায়? জীবনের উত্থান-পতনে আগন্তুক ফিকরি বিষয়ে কার সাথে পরামর্শ করবে?
হাফেজ শিরাজি রাহি. হয়তোবা এ ব্যাপারেই বলেছিলেন–

مراد دل ز کہ جویم کہ نیست دل دارے

کہ جلوہ نظر و شیوہ کرم دارد

আমি লক্ষ্য তালাশ করব কোথায়? এজন্য যে, এমন সান্ত্বনাদাতা থাকেননি, যার চোখে আছে শুভদৃষ্টি ও অভ্যাসে সহমর্মিতা।
এতদসত্ত্বেও মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া অনুচিত। আল্লাহ পাক দারুল উলুম দেওবন্দের হেফাজত করুক। হজরতুল উসতাজের সন্তানাদি, আত্মীয়-স্বজনও মুহিব্বিনকে সবুরে জামিল দান করুক। আর এটি মহান আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব কিছু না।

উন্নতি ও সফতার রহস্যকথা

প্রবন্ধারের দৃষ্টিতে হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহুর উন্নতি ও অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতার প্রধান দুটি কারণ রয়েছে।

এক. হালাল রিজিকের বরকত– অধম ছাত্রকালে হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহুর কাছে কুরআন মুখস্থ করছিলাম। সেযুগে তার সম্মানিত পিতা জনাব ইউসুফ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যুঃ ১৯ জুলকাদা ১৪১২ হিজরি) নিজ এলাকা থেকে কিছুদিনের জন্য দেওবন্দে আগমন করেন এবং ছেলে হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহুর ঘরে অবস্থান করেন। প্রতিদিন সবক শুনানোর জন্য হাজিরি দেওয়ার সুবাদে হজরতওয়ালার পিতার সাথে কয়েকবার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। চেনা-জানার সুযোগ হয়েছে। তিনি নিয়মতান্ত্রিক আলেমে দীন না হলেও নিঃসন্দেহে একজন স্বচ্ছ অন্তরের অধিকারী, মুত্তাকি ও সুন্নাতের পাবন্দ ছিলেন। অভাব সত্ত্বেও সন্তানাদির শিক্ষাদীক্ষার প্রতি এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন যে, একজন ছেলে ছাড়া সবাইকে হাফেজ ও আলেম বানিয়েছেন।

আমি একবার জনাব ইউসুফ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে আরজ করলাম, আপনি কতইনা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে হজরতুল উসতাজ মাওলানা মুফতি সাঈদ সাহেব পালনপুরি (উসতাজে হাদিস, দারুল উলুম দেওবন্দ) এবং হজরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব (উসতাজ, দারুল উলুম দেওবন্দ) দ্বয়ের মতো সন্তানের নেয়ামত দ্বারা মালামাল করেছেন। অথচ আপনি নিজেই নিয়মিত আলেম নন। বলুন তো, সন্তানদের সফলতার মূল রহস্যকথা কী? বললেন, এটি আল্লাহ তাআলারই কৃপা ও অনুগ্রহ। তিনিই আসল রহস্য জানেন। তবে এটুকু বলতে পারি যে, আলহামদুল্লিাহ, আমি স্বজ্ঞানে সন্তানদেরকে একটি লোকমাও হারাম বা সন্দেহপূর্ণ খাবার খাওয়াইনি। অতঃপর নিজের একটি ঘটনা শুনালেন, যার সারসংক্ষেপ এরকম।

"যখন জামিয়া তালিমুদ্দিন ডাবিল (গুজরাট) এ শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানি, মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি সাহেব এবং হজরত আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি রাহিমাহুমুল্লাহ পড়াতেন, তখন আমি সেখানে পড়তাম। আমি হজরত মাওলানা বদরে আলম সাহেব মিরাঠি রাহিমাহুল্লাহুর খেদমত করতাম। একবার মিরাঠি রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বলেছিলেন, ইউসুফ! তোমাদের বেরাদরির লোকজন অনেক ভালো মানুষ। কিন্তু তাদের মাঝে এমন একটি ত্রুটি আছে, যার ভিত্তিতে আমি বলেতে পারি যে, তাদের মাঝে ভালো আলেম জন্মগ্রহণ করবে না। সবাই মহাজনি সুদে জর্জরিত হওয়ায় তাদের উপার্জন হারাম। আর হারাম ও নাজায়েজ খাদ্য থেকে ভালো আলেম জন্মগ্রহণ করতে পারে না। অতএব, ভবিষ্যতে তুমি নিজের সন্তানদের ভালো আলেম বানাতে চাইলে হারাম ও নাজায়েজ সম্পদ থেকে বিরত থাকতে হবে। সন্তানদেরকেও বিরত রাখতে হবে।

আমার পিতাও (মুফতি সাহেবের দাদা) ব্যবসায়ীদের থেকে সুদের ওপর ঋণ নিয়েছিলেন। হজরত মিরাঠি রাহিমাহুল্লাহুর কথা শুনে তাকে মহাজনি ঋণ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনেননি; বরং

বিপরীতে আমাকে আলগা করে দেন। ফলে আমি শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে মনস্থ করলাম যে, প্রয়োজনে ক্ষুধার্ত থাকব তবুও হারাম বা সন্দেহযুক্ত সম্পদ স্পর্শ করব না। আমি পড়তে না পারলেও সন্তানাদি পড়ে ভালো আলেম হতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

অতঃপর নিজ উদ্যোগে উপার্জন শুরু করি। হারাম বা সন্দেহযুক্ত জীবিকা থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। সন্তারদেরকেও রক্ষা করি। তাদের শিক্ষার দিকে মনোযোগী হই। এজন্য আল্লাহ তাআলা একজন ছাড়া সবাইকে হাফেজ ও আলেম বানিয়েছেন।”

প্রবন্ধকার বলি, হজরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর সম্মানিত পিতার দীক্ষা ও নেক জজবার প্রভাব হয়েছে যে, তিনি সর্বদা পরিতুষ্টি ও অমুখাপেক্ষীতার সাথে জীবন অতিবাহিত করে নিজে ও সন্তারদেরকে সন্দেহপূর্ণ জীবিকা থেকে বাঁচিয়েছেন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুফতি সাহেব ফারেগ হওয়ার পর নয় বছর দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির এ পড়িয়েছেন। দারুল উলুমে নিয়োগ হয় ১৩৯৩ হিজরি সনে। তিনি তুচ্ছ ওজিফার ওপর তুষ্ট করতঃ দিবারাত্র মুতালাআ, পাঠদান ও লেখালিখিতে লিপ্ত থাকতেন। পাঠদানের সূচনালগ্নে ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে। তবুও সর্বদা সবুর ও তাওয়াক্কুলের পরিচয় দিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা রচনাবলীকে গ্রহণযোগ্যতা দান করলেন। নিজস্ব কুতুবখানা ‘মাকতাবায়ে হিজাজ’ থেকে প্রয়োজনীয় জীবিকা আমদানীর ব্যবস্থা হয়ে গেল। ১৪২৩ হিজরি সনে বাইতুল্লাহ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে বেতন গ্রহণ করা বন্ধ করে দিলেন এবং ১৩৯৩ হিজরি থেকে ১৪২৩ হিজরি পর্যন্ত যা গ্রহণ করেছিলেন তাও ফিরিয়ে দিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দে নিয়োগপূর্বে দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির থেকে গ্রহণ করা নয় বছরের বেতনও ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর ওফাত পর্যন্ত বিনা বেতনে দীনের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন।

একবার হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহ স্বয়ং আমাকে বলেছিলেন, আমার সম্মানিত পিতার চাহিদা ছিল যে, আমি শুরু থেকেই বিনা বেতনে পড়াই। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম যে, ছাত্র জমানায় তিনি সাধারণ আয় থেকে আমার ওপর ব্যয় করেছেন এবং এখন শিক্ষকতার যুগেও আমার ও সন্তানাদির ব্যয়ভার গ্রহণ করবেন; এটি অনুচিত। এ কারণে বেতন গ্রহণে রাজি হয়ে যাই। কিন্তু সঙ্কল্প করি যে, আল্লাহ তাআলা তওফিক দিলে ওয়ালিদ সাহেবের ইচ্ছা পূরণ করে পূর্বের উসুলকৃত বেতনও ফিরিয়ে দেব।

দুই. কুরআনে কারিমের সাথে অগাধ সম্পর্ক ও মহব্বত– অধমের দৃষ্টিতে হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহুর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও সফলতার আরেকটি কারণ ছিল কুরআনে পাকের সাথে অগাধ মহব্বত ও সম্পর্ক। দারুল উলুম দেওবন্দে অবস্থানকালে অধম বিষয়টি বারবার প্রত্যক্ষ করেছি। কেউ হজরতওয়ালার সামনে তিলাওয়াত করলে বা নিজে তিলাওয়াত করলে এমন মনে হত যে, তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল সম্পর্ক সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলা ও তার কিতাবের সাথে জুড়ে গেছে। চক্ষু অশ্রুসিক্ত ও চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে যেত।

এই কৈফিয়ত স্মরণ করে আজও আফসোস করি যে, আমাদের জীবনে একবার হলেও এমন কৈফিয়ত সৃষ্টি হলে হয়তোবা সফলকাম হতে পারতাম। কিন্তু “এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন দান করেন।”

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসসমূহের আলোকে কুরআনের সাথে হজরতুল উসতাজের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় যে, কুরআনে পাকের সাথে অগাধ ভালোবাসাই বেনোজির জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার বড় কারণ ছিল। কেননা, এই হাদিসসমূহের আলোকে সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের সবচে বড়

মাধ্যম হচ্ছে, কুরআনের সাথে সম্পর্ক ও ভালোবাসা। ইমাম বুখারি রাহি. হজরত আবু হুরায়রা রা. -এর সূত্রে নকল করেছেন–

لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা কোন নবিকে এতকিছুর অনুমতি দেননি যতকিছুর অনুমতি দিয়েছেন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। অর্থাৎ সুরেলা আওয়াজে কুরআন পড়ার অনুমতি দিয়েছেন।[৩]

হজরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ.

অর্থ: বান্দা কিছুর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ততটা নৈকট্য অর্জন করতে পারে না যতটা পারে আল্লাহ তাআলা থেকে আগত বস্তু তথা কুরআন দ্বারা।[৪]

একটি নীরব আকাঙ্ক্ষা; যা পূর্ণ হয়েছে

হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহ নিজের জীবন এতটা স্বার্থক বানিয়েছিলেন যে, বর্তমান যুগে দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন। অবিরাম দীনের খেদমত করতে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেননি। যথাসম্ভব তিনি চাইতেন যে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন যখন জিজ্ঞাসা করবেন– কী কাজে শরীর ক্ষয় করেছে? জবাবে বলবেন– আপনার কিতাব ও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর খেদমতে।

অধিক পরিশ্রম ও বার্ধক্যের কারণে জীবনের শেষদিকে ডায়বেটিস ও হৃৎপিণ্ডের নানা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। সাধারণত এই বয়সে সুস্থতার আশা কম ও রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা বেশি থাকে। এমতাবস্থায় নিশ্চয় হজরতওয়ালার নীরব তামান্না ছিল যে, জীবনের নিকৃষ্টতম অংশে পৌঁছার আগেই কুরআন-সুন্নাহর খেদমতের হালতেই রবের সান্নিধ্যে হাজিরা

---

৩. সহিহ বুখারি ২/৭৫১।

৪. সুনানে তিরমিজি ২/১১৯।

দিবেন। প্রিয় ছাত্রদেরকেও শিক্ষাবর্ষের মাঝখানে আলবিদা জানাবেন না, যাতে করে সহিহ বুখারির দারস অসম্পূর্ণ রয়ে না যায়। বছরের মধ্যখানে বিদায় জানিয়ে দারুল উলুমের মজলিসে শুরাকে নতুন শাইখুল হাদিস ও সদরুল মুদাররিসিন নিয়োগদানে ব্যতিব্যস্ত করবেন না।

আল্লাহ তাআলা পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান বান্দার নীরব তামান্না এভাবে পূরণ করেছেন যে, তিনি সহিহ বুখারির পাঠদান পূর্ণাঙ্গ করে একটি বাক্যের মাধ্যমে ছাত্রদের থেকে বিদায় নিয়ে নেন– "এখন আল্লাহ তাআলা যা চাইবেন তাই হবে।"

অতঃপর রমজানুল মোবারকে সফর ও অত্যন্ত দূর্বলতার অবস্থায় বিশ্রামের পরিবর্তে প্রতিদিন তারাবির পর দারসে কুরআনের সূচনা করেন। ইলমি ও ইসলাহি মূল্যবান মুক্তাবাণী ছড়ালেন। এত বেশি দুর্বলতা ছিল যে, ভক্তরা (অধমও ফোনে) কিছুদিন দারস বন্ধ রাখতে ও বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি নাকচ করে ১৫ রমজান অবধি অব্যাহত রাখেন। এই কৈফিয়তের ব্যাপারেই হাফেজ শিরাজি রাহিমাহুল্লাহুর কবিতা প্রযোজ্য হয়–

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید

یا تن رسد به جاناں یا جان ز تن بر آید

লক্ষ্য অর্জন করা পর্যন্ত চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রাখব
হয়তোবা মাহবুবে হাকিকি পর্যন্ত পৌঁছা নসিব হবে বা তার জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন করে দেব।

১৫ রমজানুল মোবারকের পর যবানে কথা বলার শক্তি থাকেনি। এ থেকেই পরকালের যাত্রা শুরু হয়ে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যেই শেষ দশকের ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি সনে আমাদেরকে বিচ্ছেদ করে চলে যান।

অধম প্রবন্ধকার যখনই হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহুর পূর্ণ জীবন বিশেষ করে শেষের ঈর্ষনীয় দিনগুলো নিয়ে ফিকির করি তখন অনিচ্ছায় যবান দিয়ে শব্দগুলো বেরিয়ে আসে–

عَاشَ سَعِيْدًا وَمَاتَ سَعِيْدًا، وَسَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ سَعِيْدًا.

"সৌভাগ্যের জীবনযাপন করেছেন। সৌভাগ্যের মৃত্যু নসিব হয়েছে। কেয়ামতের দিন সফল অবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবেন, ইনশাআল্লাহ।"

আল্লাহ তাআলা এই ফিকিরের বদৌলতেই আমাকে মহান উসতাজ ও মুরব্বির বিচ্ছেদে ধৈর্যধারণের তওফিক দিচ্ছেন।

পরিশেষে আশাবাদী যে, পূর্বাপর সম্পর্কহীন কিন্তু অন্তরের গহীন থেকে নির্গত ভাঙ্গাচুরা কথাগুলো দ্বারা পাঠকবৃন্দ, হজরতুল উসতাজের সন্তানাদি, আত্মীয়স্বজন, সম্পৃক্ত ও ভক্তদের সবুরের তওফিক নসিব হবে।

বারবার প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কলম নিজের অবস্থার ভাষায় ঈষৎ পরিবর্তন করতঃ প্রসিদ্ধ এই কবিতা পুনরাবৃত্তি করে সামনে চলতেই থাকে–

أَعِدْ ذِكْرَ «سَعِيْد» لَنَا إِنَّ ذِكْرَهُ
هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ

"শায়খ সাঈদের আলোচনা পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন। তার আলোচনা যতই পুনরাবৃত্তি করবেন ততই কস্তুরীর সুরভি ছড়াতে থাকবে।"

হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহ রেখে গেছেন নয়জন ছেলে ও দুইজন মেয়ে। তারা সবাই কুরআনের হাফেজ। দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত। দীনের খেদমতে নিয়োজিত। আরও দুইজন ছেলে জীবদ্দশায়ই ইনতিকাল করেন। তারাও ছিলেন হাফেজে কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত।

আল্লাহ তাআলা হজরতুল উসতাজ রাহিমাহুল্লাহুকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উঁচু মাকাম দান করুক। সন্তানাদি, আত্মীয়স্বজন, দারুল উলুম দেওবন্দের পরিচালকবৃন্দ, আসাতিজায়ে কেরাম ও ছাত্র, হজরতের সমস্ত ছাত্র, সম্পৃক্ত ও ভক্তদের সবুরে জামিল দান করুক। (আমিন)